ক্যান্সার একার লড়াই নয়

অরুণাভ সেনগুপ্ত

অজ্ঞানতা ও অসচেতন সামাজিক ভাবনার কারণে বারেবারেই মানব সভ্যতা পর্যুদস্ত হয়েছে জনপদ ধ্বংসকারী নানা পরিবেশজাত কালান্তক ব্যাধির আক্রমণে। অপ্রস্তুত সমাজের প্রতিক্রিয়াও হয়েছে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন। চতুর্দশ শতকের ইওরোপে 'ব্ল্যাক ডেথ' বা প্লেগের প্রাদুর্ভাব জন্ম দিয়েছিল তীব্র আতঙ্কের, আধিভৌতিক, অদ্ভুতুড়ে সব অনুষ্ঠান আর ডিস্টোপিয়ান সাহিত্যের। রোগ ছিল ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের শাস্তি, প্রতিকার ছিল অনুশোচনায়, প্রায়শ্চিত্তে, আপন দেহে কশাঘাত। উনিশ শতকে সর্বব্যাপী ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মাকে সমাজ দেখল রোমান্টিক এক সাহিত্যের প্রেক্ষিতে, রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ আর স্যানাটোরিয়ামে ক্ষয়ে যাওয়া জীবন হল এক বিষাদময় নান্দনিকতা বা 'হোয়াইট ডেথের' প্রতীক। কয়েক কোটি লোক মারা গেলেও স্প্যানিশ ফ্লু-র সময় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের সমাজ ছিল এমনই অবসাদগ্রস্ত যে, মননে-সাহিত্যে সেই অতিমারি প্রায় স্মৃতিবিহীন। শীতলাদেবী, ওলাবিবির মতো লোকজ ঐশীশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ অতীত হলেও অদ্যাপি সমাজ এখনও প্রকৃতি ও পরিবেশের মোকাবিলায় তেমনই অপ্রস্তুত, তেমনই রাষ্ট্র ও সমাজের উচ্চতম স্তরও নানা ভিত্তিহীন একগুঁয়েমি আধিপত্যের শিকার। বিগত চার দশকে এইডস থেকে করোনা অতিমারি, সবই তার জীবন্ত সাক্ষ্য। সাম্প্রতিক নিভৃতবাসের বাধ্যতা, বিপন্নতা, অসহায় মৃত্যু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভের, প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা আস্থাহীনতার জন্ম দিলেও ইতিহাসের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা তেমনই জন্ম দিয়েছে এক সমষ্টিগত সামাজিক বোধের। কিছুটা হলেও শিখিয়েছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে আগন্তুক রোগের কারণে জন-স্বাস্থ্যহানির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের ভাবনা। সে ভাবনা কিন্তু সঞ্চারিত হয়নি আজকের অন্যতম প্রধান মারণ রোগ ক্যান্সারের প্রতি।

করোনা কালের তিন বছরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা সরকারি হিসেবে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার (বেসরকারি হিসেবে ৪০ লক্ষ), যে সময়কালে ক্যান্সারে মৃত্যুর নথিভুক্ত সংখ্যাই ২৩ লক্ষ, যাতে যোগ হয়নি বহু অনির্ণীত, অচিকিৎসিত মৃত্যুর সংখ্যা। অথচ বৃহত্তর সমাজের চোখে ক্যান্সার কোনও যৌথ বিপর্যয় নয়, একজন আক্রান্ত মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক যুদ্ধ। রাষ্ট্র ও সমাজের যৌথ দায়িত্বের চাইতে বেশি প্রকট আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশেষ যোদ্ধার অভিধায় আখ্যায়িত করার প্রবণতা। সামাজিক আলাপে, লেখ্য ভাষ্যে 'ক্যান্সার' শব্দটি সর্বজনীন ভাবে ভিতর থেকে ঘুণ-ধরানো অনিবার্য ভাবে বিনষ্টকারী এক প্রক্রিয়ার রূপক হিসেবে ব্যবহার হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় বা নাগরিক সচেতনতায় সত্যিকার রোগটির বাস্তব দিকগুলি গুরুত্ব পায় না। 'ব্যক্তিগত যুদ্ধ', 'ক্যান্সার বিজয়ী বীর' ইত্যাদি আরোপিত শব্দবন্ধের আড়ালে সামনে আসে না আরেকটি ক্রমবর্ধমান সমষ্টিগত সমস্যা— পরিবেশ দূষণ। নজরে পড়ে না পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতায়, সরাসরি পরিবেশ দূষণের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ক্যান্সার কতটা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

যেকোনও ক্যান্সারের মূল কথা জীবকোষ নিয়ন্ত্রণকারী জিনের পরিবর্তন (জেনেটিক মিউটেশন), যা আসতে পারে উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ঘটতে পারে বেশিমাত্রায় ক্ষতিকর রাসায়নিক বা বিকিরণকারী পদার্থের দীর্ঘকালীন সংস্পর্শে, যার উৎস আমাদের পরিবেশ ও তৈরি-করা নানা কৃত্রিমতা, যন্ত্রপাতি। কলকাতার বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র ক্যান্সার-কারক ধূলিকণা (পিএম ২.৫ ও পিএম ১০) এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা আন্তর্জাতিক সুরক্ষা রেখার বহুগুণ ওপরে। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, নির্বিকারে ধোঁয়া ছেড়ে যাওয়া ডিজেলচালিত ভারী যানবাহন, পরিবেশ রক্ষার নিয়ম না-মেনে ব্যাপক নির্মাণ, সর্বোপরি ঘনবসতি এলাকাতেও মানুষের শোবার ঘরের জানালার বাইরেই মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি ব্যবহার করা অসংখ্য ছোট-বড় কারখানা বাতাসকে বিষাক্ত করে। যাতে ধূমপান না করেও মানুষ ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। কলকাতায় ফুসফুসের ক্যান্সারের হার ভারতে সর্বাধিক (উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি ছাড়া), যাদের মধ্যে অধূমপায়ী প্রায় ২৫%। অন্য দিকে, গাঙ্গেয় অববাহিকা এবং উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের ক্ষতিকর মাত্রায় উপস্থিতি অসংখ্য সমীক্ষায় প্রমাণিত এবং তা সংশোধনের প্রচেষ্টা এখনও অপ্রতুল। এইসব এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের মধ্যে পিত্তথলির ক্যান্সারে আক্রান্তের হার সারা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বাধিক, যার কারণ আর্সেনিকযুক্ত জল, খেতের সবজি, কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, ভারী ধাতুমিশ্রিত (লেড বা ক্যাডমিয়াম) শিল্পনির্গত রাসায়নিক বর্জ্য। পুরুষদের মধ্যে বাড়ছে মূত্রথলির ক্যান্সার। বাতাসে ভাসা বেঞ্জিন জাতীয় রাসায়নিকের জন্য বাড়ছে লিউকেমিয়ার মতো রক্তকোষজনিত নানা ক্যান্সার, বিশেষ করে শিশু ও কমবয়সিদের মধ্যে। এত পরিবেশ দূষণের ফলে শুধু বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ক্যান্সার বাড়ছে তাই নয়, বাড়ছে 'ট্রান্সজেনারেশনাল ক্যান্সার' বা পরের প্রজন্মের ক্যান্সার হওয়ার বাড়তি প্রবণতা। এটা কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পরিবর্তিত বা মিউটেটেড জিনের (জার্ম লাইন মিউটেশন) কারণে হওয়া ৫-১০% ক্যান্সার থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে দূষিত পরিবেশে বাস করা পিতামাতাদের সন্তানরা হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত জিন নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা (এপিজেনেটিক সুইচ) নিয়ে জন্মাচ্ছে। এই ক্ষতিকর এপিজেনেটিক পরিবর্তনগুলি থেকে হয়তো বর্তমান প্রজন্মের ক্যান্সার হচ্ছে না, কিন্তু জিনগত ভাবে ক্যান্সারের সম্ভাবনা সঞ্চারিত হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে, যারা ওই একই পরিবেশ দূষণ বা ধূমপান ইত্যাদি অভ্যাসের শিকার হলে আরও তাড়াতাড়ি আরও বেশি সংখ্যায় ক্যান্সার আক্রান্ত হবে।

ব্যক্তিগত জীবনশৈলী, স্বেচ্ছায় পান-তামাক-মদ-অস্বাস্থ্যকর খাবার ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যান্সারকারক বস্তুদের শরীরে আত্মভূত করা ছাড়াও, অজান্তে অনিচ্ছাকৃত ভাবে পরিবেশ থেকে আসা ক্যান্সারকারক বস্তুদের প্রভাবেও যে অনেকের ক্যান্সার হচ্ছে এই আলোচনাটা সমাজবৃত্তে প্রায়শই অস্ফুট। এমন নয় যে সমস্যাগুলি আর তার উত্তরগুলি জানা নেই। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা আছে, আছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সমিতির উপদেশ। প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তনের। ক্যান্সারকে শরীরের নিজস্ব কোষের বিদ্রোহ বলে ব্যাখ্যা করলেও, সে বিদ্রোহে যোগদান আছে পরিবেশ দূষণের উস্কানিরও। রাচেল কারসন লিখেছিলেন, কীভাবে দূষিত পৃথিবীতে নবীন ফুলপাতা, পাখির ডাকবিহীন বসন্ত নীরবে আসে আর মারণ রোগের অদৃশ্য বিস্তার ঘটে। সে বিস্তার আটকাতে গোটা সমাজকেই যৌথ ভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। আক্রান্তকে যোদ্ধার তকমা দিয়ে দায় সারলে হবে না।

লেখক বিশিষ্ট চিকিৎসক